ইহজাগতিকতার প্রশ্ন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বাংলাদেশের একজন বরেণ্য বুদ্ধিজীবী এবং পেশায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক। বাংলাদেশে মুক্ত-বুদ্ধি চর্চার পথিকৃত, লেখক এবং কলামিস্ট। আরজ আলী মাতুব্বরকে তিনিই প্রথম 'আরন্যক দৃশ্যাবলী' এবং পরে 'দেনিক ইত্তেফাক' এ নিয়মিত কলামের মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজে তুলে ধরেন একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে; নাম - 'আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন জিজ্ঞাসা'। তাঁর নিম্ন প্রদত্ত বক্তৃতাটি 'আরজ আলী স্মারক বক্তৃতা ১৪০৯' উপলক্ষ্যে ২৬ এ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে বাণিজ্য অনুষদ মিলনায়তন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়। ডঃ চৌধুরী তার বক্তৃতাটি 'ইহজাগতিকতার প্রশ্ন' শিরোনামে মুক্ত-মনায় প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। কিছুটা সংক্ষেপিত আকারে এখানে প্রকাশ করা হল।

আরজ আলী মাতুব্বরকে আমরা স্মরণ করবো, অনেককাল ধরে। একটা কারণ তিনি ইহজাগতিক ছিলেন, সেই সময় ও সমাজে যেখানে ইহজাগতিকতার চর্চা ছিল ক্ষীণ। আরেকটি কারণ ইহজাগতিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে তিনি তথাকথিত আধ্যাত্মবাদের বিষয়ে কতগুলো সরল কিন্তু প্রয়োজনীয়, এবং আপাত নিরীহ কিন্তু আসলে বিস্ফোরক প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন। প্রশ্নগুলো নতুন নয়, এ প্রশ্ন এমনকি আমাদের সমাজেও লোকের মনে জেগেছে। কিন্তু তিনি যেভাবে সাজিয়ে নিয়ে তাদেরকে জনসমক্ষে উপস্থিত করেছেন তেমন ঘটনা আগে ঘটেনি। জিজ্ঞাসার সাথে যুক্ত হয়েছিল সাহস। এইখানে তিনি অসাধারণ ছিলেন।

১

ইহজাগতিকতা থাকলে পারলৌকিকতাও থাকে, আলো থাকলে যেমন থাকে অন্ধকার, হয়তো বা বলা যাবে মাটির ওপরে আকাশ; কিন্তু ইহজাগতিকতা পারলৌকিকতার অনুগত নয়, অবজ্ঞা না করলেও উদাসীনতা যে দেখায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইহজাগতিকতার ভাবটা এই রকমের যে, পরলোক আছে কিনা জানি না, থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাকে

নিয়ে আমার উৎসাহ নেই; আমার জগৎ ইহজগৎ, সেখানেই আমার আগ্রহ। ইহকাল আছে, ইহকাল ইহজগৎ থেকেও ভিন্ন। কেননা কাল অনেক বিস্তীর্ণ জগতের তুলনায়।

অন্য অনেক কিছুর মত ইহজাগতিকতারও দুটি দিক রয়েছে। একটি তাত্ত্বিক, একটি প্রায়োগিক। তাত্ত্বিক দিকটি দার্শনিক; প্রায়োগিক দিকটিতেও দার্শনিকতা রয়েছে, কিন্তু সেখানে জোরটা পড়ে জীবনযাপনের ওপরে। মেহনতি মানুষেরা যে-সব সময়ই ইহজাগতিক সেটা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই, কেননা প্ররোচনা থাকে আধ্যাত্মিক হবার। ইহজাগতিকতার শত্রুপক্ষ ওই প্ররোচনাটি দিয়ে থাকে, নিজের স্বার্থে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের সাধারণ প্রবণতাটি হচ্ছে ইহজাগতিক হবার। না হয়ে উপায় নেই। কেননা তাকে তো পরিশ্রম করতে হয়। জগতের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে বাঁচতে হয়, প্রত্যক্ষ জগৎ-কে অবজ্ঞা করবে এমন সুযোগ তার জন্য খুবই কম।

আধ্যাত্মবাদ ইহজাগতিকতার বিপরীতপক্ষ বটে, কিন্তু ইহজাগতিকতার আসল শত্রু সেখানে নেই, রয়েছে অন্যত্র। আধ্যাত্মবাদ এই শত্রু দ্বারা ব্যবহৃত হয়। আকর্ষণ করে, মোহ গড়ে তোলে । আসল শত্রুটা তাহলে কে? সে হচ্ছে ভয়। যে দুর্বলতা আরজ আলী মাতুব্বরের ছিল না।

ইহজাগতিকতা নাস্তিকতা নয়। ইহজাগতিক হতে হলে নাস্তিক হতে হবে এমন কোন দিব্যি নেই; যদিও ইহজাগতিকদের নাস্তিক বলার অভ্যাসটা কোথাও কোথাও রয়েছে। নাস্তিকতার কথাটা বলা হয় ইহজাগতিকদের ঘায়েল করার জন্য। বস্তুত নাস্তিক না হয়ে তো বটেই, এমনকি ধর্মবিশ্বাসী হয়েও ইহজাগতিক হওয়া যায়। ইহজাগতিকাতার ইংরেজী হচ্ছে সেকুলারিজম।; সেকুলারিজমের ধারণাটি আমরা আধুনিক ইউরোপ থেকে পেয়েছি, যদিও সেকুলারিজম ব্যাপারটা আমাদের এই অঞ্চলে আগেও ছিল, অনেক আগেই। আধুনিক ইউরোপে ওই প্রত্যয়টি প্রতিষ্ঠার পেছনে যাঁর ভূমিকা বেশি করে উল্লেকযোগ্য, তিনি হলেন ফ্রান্সিস বেকন। বেকন মোটেই নাস্তিক ছিলেন না, নাস্তিকতার বরঞ্চ বিরোধিতাও করেছেন তাঁর কিছু লেখাতে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ইহজাগতিক ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ঈশ্বর আচেন, তিনি থাকবেনও কিন্তু ঈশ্বরকে থাকতে দিতে হবে তাঁর নিজের জায়গায়, তাঁকে জাগতিক কাজকর্মের সাথে মিশিয়ে ফেলা চলবে না। ওই মিশিয়ে ফেলাট ভুল এবং ক্ষতিকর। ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসের বাপার, আর জগৎ চলে প্রাকৃতিক নিয়মে। জগতের চালিকাশক্তি ধর্মবিশ্বাস নয়, নানা ধরনের দ্বন্দ্ব। বিশ্বাসের যেমন দরকার আছে, তেমনি দরকার আছে যুক্তি-বুদ্ধিরও দরকার আছে, কিন্তু তাদের সংমিশ্রিত করে ভেজাল উৎপাদন খুবই অনায়। যাকে আমরা ধর্ম নিরপেক্ষতা বলি, তার মূল বাপারটাও ওটাই; রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম মিশিয়ে না ফেলা।

ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এই কথাটা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই জোরেশোরে বলা হয়েছে। কথাটা সত্য বটে আবার মিথ্যাও বটে।

সত্য এই দিকে যে, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নাগরিকদের এই পরামর্শ দেয় না যে, তোমাদেরকে ধর্মহীন হতে হবে; কিন্তু তা বলে এমন কথাও বলে না যে, রাষ্ট্র নিজে সকল ধর্মেরই চর্চা করবে কিংবা নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উৎসাহিত করবে; রাষ্ট্র বরঞ্চ বলবে ধর্মচর্চার ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন আগ্রহ নেই, রাষ্ট্র নিজে একটি ধর্মহীন প্রতিষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস নাগরিকদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্রের ওই ধর্মহীনতাকেই কিছুটা নম্রভাবে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা। ইহজাগতিকতা হুবহু বস্তুতান্ত্রিকতা নয়, কিন্তুবস্তুতান্ত্রিকতা থেকে খুব বেশী দূরে তাও নয়।

জগৎ সত্য। সে অত্নত বাস্তবিক। কিন্তু এই বাস্তবিক সত্যটাকে খাটো করে দিতে চায় ইহজাগতিক শত্রুপক্ষ। তারা ধর্মকে টেনে নিয়ে আসে সামনে। ধর্ম্বিশ্বাসের পেছনে একটা ভয় থাকে। পরকালের ভয়। অজানাকে ভয়। ওই ভয়টাকেই কাজে লাগানো হয়। ইহজাগতিকতার যারা বিরুদ্ধপক্ষ তারা ওই ভয়টাকেই কাজে লাগায়। তারা নিজেরা অবশ্য ভীতু। ভয় থেকেই ইহজাগতিকতার বিরুদ্ধে তারা কাজ করে। ভয় থাকে পরকালের। কিন্তু তার চেয়েও বড় হয় স্বার্থহানির। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে যাদের জাগতিক স্বার্থ জড়িত, তারা ধর্মকে ব্যভার করে থাকে নিজেদের শাসন শোষন নিপীড়ন তথা কায়েমী স্বার্থ রক্ষার যে চেষ্টা তার আচ্ছাদন হিসেবে। ঈশ্বরই এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে কেউ বড় হবে কেউ ছোট। এটাই ধর্মের বিধান বলে তারা প্রচার করে। ইহজাগতিকতা ধর্মের আচ্ছাদনটি যদি সরিয়ে নেয় তাহলে কায়েমি স্বার্থয়ালাদের কদর্য কাজটা উন্মোচিত হয়ে জনসমক্ষে এসে যাবে, এই ভয়ে তারা ইহজাগতিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। দরকার হলে যারা ইহজাগতিক তাদের জব্দ করে। হত্যাও করেছে, ইতিহাসে নজীর আছে।

সাধারণ মানুষ যে ধর্মের কাছে যায় তা কেবল ভয়ে নয়, ভরসাতেও। এই জগতে বিচার নেই, পরজগতে তারা বিচার আশা করে। জগতে নির্ভর করা যায় এমন শক্তি নেই, মানুষ তাই পরজগতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কায়েমী স্বার্থের রক্ষক ও তাদের চ্যালাচামুন্ডারা মানুষের এই ধর্ম্বাদিতাকেও ব্যবহার করে থাকে নিজেদের কায়েমী স্বার্থে। ইহজাগতিকতার শত্রুপক্ষ মুখে যায় বলুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত ইহজাগতিক। বিষয়সচেতন।

ইহজাগতিকতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের রক্ষকদের দ্বন্দ্বটা খুবই স্বাভাবিক। বঞ্চনাকারীরা বঞ্চিতদের সঙ্গে শত্রুতা করবেই।

কিন্তু পরিহাসের বিষয় এটা যে, বঞ্চনাকারীরা বঞ্চিতদেরকে তাদের পক্ষে নিয়ে নেয়। এই নেবার ক্ষেত্রে ধর্ম খুবই উপকারে আসে তাদের জন্য।

ইহজাগতিকদেরকে ধর্ম্মিরোধী হিসেবে দাঁড় করানো হয়, বলা হয় এরা জড়বাদী, বলা হয় এরা নাস্তিক। চেষ্টা করা হয় রাস্ট্রের সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলবার। ভারত একটি ইহজাগতিক রাষ্ট্র, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে সেখানে মৌলবাদীরা চেষ্টা করছে রাষ্ট্রকে ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিনত করতে। মধ্যপ্রাচ্যে কোন কোন দেশে ধর্ম ও রাষ্ট্র এক হয়ে গেছে। কেবল যে সৌদি আরবে তা নয়, ইসরাইলেও। ইসরাইলেই বরঞ্চ বেশি পরিমানে ঘটেছে ব্যাপারটা। ওই রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ই ঘটেছে একটি ধর্মীয় মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে, তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার লড়াই লড়ছে যে প্যালেস্টানীয় জনগণ তাদের মধ্যে বরঞ্চ ইসলাম ছাড়াও অন্য ধর্মের লোক রয়েছে।, খ্রিস্টানরা আছে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের একনিষ্ঠ সমর্থক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট নামে ছোট কিন্তু আস্ফালনে অনেক বড়; মুসলিম মৌলবাদীরা মনে করছে তারা জেহাদে আছে। দু'ক্ষই মৌলবাদী। এবং দু'য়ে মিলে মানুষের সভ্যতাকে পেছনের দিকে ঠেলছে। এ সত্য তো ভুলবার উপায় নেই যে, সভ্যতা একটি ইহজাগতিক ব্যাপার, এবং তার অগ্রগতিতে অতীতে ধর্মের একটা প্রগতিশীল ভূমিকাও ছিল, কেননা ধর্ম তখন বিদ্রোহ করেছে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। খ্রিষ্ট ও ইসলাম উভয় ধর্মই এসেছিল নিপীড়িত মানুষের অগ্রাভিযানের অঙ্গীকার নিয়ে। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীরা উভয় ধর্মকে ব্যবহার করেছে নিজেদের নোংরা স্বার্থে, এবং এখন দুই ধর্মের মধ্যে লড়াই বাঁধাবার তালে আছে। ধর্মের আধাত্মিক স্বার্থে নয়, নিজেদের বস্তুগত স্বার্থে। ফলে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় থেকে ইহজাগতিকতার যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তা নতুন করে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ইহজাগতিকতার আরও একটি শত্রু রয়েছে। সেটি হল মানুষে মানুষে বৈষম্য। কায়েমী স্বার্থয়ালারা নিজেদেরকে ধনী করতে গিয়ে অধিকাংশ মানুষকে গরীব করে রাখে। এই গরীব মানুষেরা নির্যাতিত হয়, তারা বিচার পায় না, ভরসা পায় না, তখন তারা ধর্মের কাছে যায়। নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পথ দুটি।, একটি গেছে বামে, অন্যটি ডানে; বামপন্থীরা ইহজাগতিক, তারা গণতন্ত্রী; ডানপন্থীদের অধিকাংশই ধর্মীয় মৌলবাদী। বৈষম্যমূলক রাষ্ট্র ইহজাগতিকদের উপর পীড়ন চালায়, ফলে সুবিধা হয় ধর্মীয় মৌলবাদীদের। তারা প্রধান প্রতিবাদকারী হয়ে উঠতে চায়। বিশ্বজুড়ে আজ এই ঘটনাই ঘটছে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ছিল ইহজাগতিক। পুঁজিবাদী বিশ্বও নিজেকে ইহজাগতিক বলে প্রচার করে। কিন্তু দু'য়ের মধে মৌলিক ব্যবধান রয়েছে। প্রথম কথা হল এই যে, পুঁজিবাদীরা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে; আর দরিদ্র মানুষ বাধ্য হয় ধর্মের কাছে ছুটতে। দ্বিতীয় সত্য এটা যে, পুঁজিবাদীরা ভোগবাদী, দরিদ্র বঞ্চিত মানুষ নিজেদেরকে ভোগ থেকে বঞ্চিত দেখে পরকালে

স্বর্গ পাবে এই আশার মধ্যে স্বান্তনা খোঁজে। তৃতীয়ত, পুঁজিবাদীরা মৌলবাদীদেরকে সরাসরি উৎসাহিত করে ডানপন্থী হতে; আর ডানদিকে এগুলে মৌলবাদী হতে যে বিলম্ব ঘটে তা নয়।

২

আমাদের এই উপমহাদেশে মানুষজন খুবই আধ্যাত্মিক বলে একটা রটনা আছে। এই রটনা বিশেষভাবে জোরদার হয়েছে ইংরেজ কর্তৃক ভারত দখলের পর থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পর থেকেই দেখা গেছে ভারতবর্ষীয়রা তাদের ধর্মীয় উত্তরাধিকার নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেছে। একাধিক কারণে এটা ঘটেছে। প্রথমত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অভিমান তৈরী হয়েছে। নতুন শাসকরা তাকে নানাভাবে পীড়িত করছিল, ফলে তার মধ্যে একটা আগ্রহ জন্মেছে দাঁড়াবার জায়গা খুঁজবার। প্রশাসন ব্যবসা-বানিজ্য সব কিছুই বিদেশীরা দখল করে নিয়েছে, দেশী মানুষ এখন যায় কোথায়? গেছে ধর্মের কাছে। ইংরেজদের মধ্যে মিশনারীদেরকে দেখা যাচ্ছিল, যারা স্থানীয় মানুষদের ধর্মান্তরিত করার উদ্যোগ নিচ্ছিল। সেটাও একটা কারণ নিজেদের ধর্মকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে রাখার পেছনে। উলটো দিকে আবার এটাও সত্য যে, উইলিয়াম জোনস ও ম্যাক্সমূলারের মতো প্রাচ্যবিদেরা প্রাচ্যে যে আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন, তার প্রচারও স্থানীয় বিদ্বজ্জনকে উৎসাহিত করেছে; তাঁরা আধ্যাত্মবাদের সন্ধানে ধর্মের কাছে চলে গেছেন। রাধাকৃষ-ানের মতো পন্ডিত ব্যক্তিরা গর্ব করে বলেছেন যে, ভারতবর্ষ যে সময়ের ধবংসলীলা ও ইতিহাসের দুর্ঘটনা সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে তার কারণ রাজনৈতিক বা সামাজিক নয়, কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষের গভীর আধ্যাত্মিকতা।

অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, ভারতীয় চিন্তার ঐতিহ্যে ইহজাগতিকতা তো বটেই, এমনকি বস্তুবাদিতাও খুব বড় সত্য। যে-বেদের আধ্যাত্মিকতার উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা করা হয়, তাতে আধ্যাত্মিকতা নয়, ইহজাগতিকতাই প্রধান। বেদে দেবতাদের সঙ্গে মানুষের যে-সম্পর্ক সেটা কেবল ভক্তির নয়, পারস্পরিক আদান প্রদানেরও বটে। গ্রীক দেবদেবীর সঙ্গে সে দেশের মানুষের সম্পর্ক থেকে এটা কিছুটা ভিন্ন রকমের। গ্রীসে দেবতা ও মানুষ পরস্পরের বন্ধুর মতো, যোগাযোগটা বেশ জানাশোনার। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যাপারটা সরাসরি দেওয়া নেওয়ার। দেবতাদের কাছে মানুষ চায় সম্পদ, সম্পত্তি, নিরাপত্তার মতো জিনিস যা দেবতারা দিতে পারে। প্রতিদানে দেবতারা মানুষের কাছে আশা করে খাদ্য, পানীয়। যেমন ধরা যাক, দেবরাজ ইন্দ্রের কথা। তিনি সোমরসের বিশেষ ভক্ত। তার পূজারীরা ওই রস সরবরাহ করে এবং বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে উপকার প্রত্যাশা করে থাকে।

গ্রীক দার্শনিকেরা দর্শনের চর্চা করতেন জীবন ও জগতের রহস্য বুঝবার জন্য। ভারতীয় দর্শনের বিকাশ ভিন্ন কারণে। কারণটা হচ্ছে দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির আকাঙ্খা। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে সূচনায় ভারতবর্ষের দার্শনিকতায় আধ্যাত্মিকতা ছিল না, ছিল যা তা হল প্রবল

ইহজাগতিকতা। ইহজগতের প্রয়োজনেই মানুষ দেবদেবীর কৃপা প্রার্থী হয়েছে; কোন তত্ত্বগত প্রয়োজনে নয়। সেজন্য দেখা যায় প্রার্থনায় ঘোড়া ও গরুর কথা আছে। গাভী যখন তার বাছুরদের উদ্দেশ্যে ডাক দেয়, তখন যে ধবনি তৈরী হয়, ঋগ্বেদে তার অতি উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে; ওই ধবনি মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গীতের মতো মধুর বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে বৃষ্টি, দীর্ঘজীবন, যৌবন, রোগের প্রতিকার, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, সব কিছুর জন্যই আন্তরিক প্রার্থনা শোনা যায়। বারবার বলা হচ্ছে আমাদের ধন ও পশু বর্ধিত হোক, আমাদের শত্রুর বিনাশ ঘটুক, আমাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাক। আমাদের কথাই আসছে, আমার কথা না-এসে; যা থেকে বোঝা যায় যে ব্যক্তি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেনি, বিচ্ছিন্ন করার মত অবস্থা তার নয়। তাকে যূথবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়, তার আশেপাশে নিরাপত্তার ভীষন অভাব, এবং দৈব-নির্ভরতা ভিন্ন তার উপায় নেই। গ্রীক দার্শনিকেরা সুখের অভাবে ছিলেন না, দর্শনের নানা কৌতূহল ও আলোচনা করবার মত জাগতিক সুবিধা তারা ভোগ করতেন; বেদের রচয়িতার জীবনে যার অভাব ছিল। বেদের সঙ্গীতময়তা খুবই সরল, আন্তরিক এবং শিল্পমূল উচ্চ পর্যায়ের। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে ওই সঙ্গীতকে টিকাভাষ্যে জর্জরিত ও দুর্বোধ্য করতে চেয়েছে, এবং সেই সঙ্গে শূদ্রের জন্য তার পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

বেদে দেবদেবীর সংখ্যা অনেক, তাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে, আধ্যাত্মিক কারণে নয়, দেবদেবীর স্বার্থে নয়, মানুষের স্বার্থে। প্রকৃতির নানা রূপকে দেবদেবীতে পরিণত করা হয়েছে সত্য, কিন্তু তাতে কোন আধ্যাত্মিকতা দেখা দেয়নি। ব্যাপারটা রয়ে গেছে বাস্তবিক এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়। সেখান থেকেই উৎসারিত, এবং সে-কারণে অমন স্বাভাবিক ও সুন্দর। আধ্যাত্মিকতার হস্তক্ষেপ ব্রাহ্মণদের অবদান।

এ প্রশ্নটা তো খুবই স্বাভাবিক, এবং সেটা উঠেছেও যে, প্রাচীন ভারত যদি অতই আধ্যাত্মিক হবে, তবে মানব সভ্যতায় সে অমন বড় বড় অবদান যোগ করলো কি করে। সভ্যতা তো সর্বদাই ইহজাগতিক, তার আধ্যাত্মিকতা বাস্তববাদিতার উপর নির্ভরশীল। আধ্যাত্মিকতা বাস্তববাদিতার জন্ম দেয়নি, বরঞ্চ উলটোটাই ঘটেছে। প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য, রসায়ন, গনিত চিকিৎসা, ভেষজশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, বিশ্ববিদ্যালয় এসব গড়ে উঠলো কি ভাবে, মানুষ যদি জগতকে উপেক্ষা করে পরলোকবাদী হয়ে থাকে? পরলোকবাদিতায় গড়ে ওঠা সম্ভব নয়; এবং তা ঘটেও নি। আধ্যাত্মিকতা প্রচারের ফলে আস্কারা পেয়েছে। বাস্তবতা ছিল ভিন্ন প্রকারের।

রাধাকৃষ-ানের মতো ভাববাদী দার্শনিকেরা মনে করেন যে, প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে দার্শনিকেরা যে ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে সেই আশাই বাস্তবায়িত হয়েছিল প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায়। কেননা ব্রাহ্মণেরা ছিলেন দার্শনিক এবং তাঁরাই চিলেন রাষ্ট্র ও সমাজের নির্দেশক। বক্তব্যটি একাংশে সত্য, অপরাংশে নয়। হ্যা, ব্রাহ্মণেরাই কর্তা হয়েছিলেন। তাঁরাই কর্তৃত্ব করতেন। সমাজে নির্মম শ্রেনী বিভাজন কার্যকর

ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরা একদিকে, অন্যদিকে শ্রমজীবী অধিকাংশ মানুষ, যারা শূদ্র বলে চিহ্নিত। ব্রাহ্মণেরা শ্রম করতো না, শূদ্রের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বস্তুত ব্রাহ্মণেরা যে কিছুতেই কৃষিকার্যে লিপ্ত হবেন না, এই নির্দেশ শাস্ত্রে বারবার দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে শূদ্রদের কাজই হচ্ছে শ্রম করা। তারা সেজন্যই জন্মেছে। আর ওই যে শ্রেনী বিভাজন, তাকে একটি ধর্মীয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেটা ছিল অনপনেয়। বলা হয়েছিল যে, শূদ্ররা শূদ্র হয়ে জন্মেছে তা এমনি এমনি নয়, আগের জীবনের কর্মদোষে বটে। তাই এ জীবনে তাদেরকে শৃম করতে হবে। করলে হয়তোবা পরজন্মে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু কেবল শৃমে কুলাবে না, সেবা করাও চাই। সেবা করতে হবে ব্রাহ্মণকে। সেটাও শূদ্রের বিধিলিপি; আগের জীবনে যে পাপ করেছে তার প্রতিফল। সেবা দিয়েই ওই পাপবন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব, বিচ্যুত হলে পরবর্তী জীবনেও ওই কাজেই করতে হবে। শ্রেণীবিভাজন অভিনব কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু প্রাচীন ভারতে আধ্যাত্মবাদী ব্রাহ্মণেরা যা করেছিলেন তা হলো ওই বিভাজনকে ধর্মীয় রূপদান।

প্লেটোর দার্শনিকরা শম করবেন না; শ্রমের দায়িত্ব শ্রমজীবীর। প্লেটোর সমাজে দাস ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, এবং দার্শনিকেরা ওই শ্রমের ওপর দাড়িয়ে বসে দর্শনের চর্চা করার সুযোগ পেতেন। সেটা ছিল একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। দার্শনিকেরা ওই ব্যবস্থাকে রক্ষা করার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। বিপ্লব ঠেকানো প্লেটো, এ্যারিস্টটল উভয়েরই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল; রাষ্ট্রকেই তারা প্রধান করেছেন, ব্যক্তিকে নয়। অত করেও এ্যারিস্টটল শাসকদের ক্রোধ থেকে মুক্ত হতে পারেননি, মৃত্যুর পূর্বে তাকে এথেন্স ছেড়ে পালাতে হয়েছিল প্রাণভয়ে। প্লেটো এমন বিপদে পড়েননি, কারণ তিনি কাল্পনিক রাষ্ট্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, বাস্তবিক রাষ্ট্রের সংবিধান তৈরীর দায়িত্ব নেননি, এ্যারিস্টটল যেমনটা নিয়েছিলেন।

সাদৃশ্য আছে, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকদের সঙ্গে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের পার্থক্যও ছিল মৌলিক। গ্রীক দার্শনিকেরা নতুন নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন, ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল পুরাতন বিদ্যার টিকাভাষ্য ইত্যাদি রচনা করা; যা ছিল জীবন্ত তাকে তাঁরা মন্ত্রে পরিনত করছেন, শব্দ মূখ্য হয়ে উঠেছে বস্তুর তুলনায়। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বার্থকে প্রধান করেছেন, গ্রীক দার্শনিকেরা যা করেননি। গ্রীক দার্শনিকদের ভিতর ভাববাদীতা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু বস্তুবাদিতাও ছিল, ছিল ইহজাগতিকতা। ভারতীয় দর্শনেও বস্তুবাদিতা ছিল, কিন্তু ওই দুই উপাদানকে ব্রাহ্মণেরা কখনই গুরুত্বপূর্ণ হতে দেননি, চেষ্টা করেছেন বরঞ্চ অপদস্থ করে দিতে। যাতে করে সাধারণ মানুষ ওই সব বিষয়ে উৎসাহী না হয়, প্রশ্ন না তোলে, অসঙ্গতি দেখে বিদ্রোহ না করে বসে। বিদ্রোহ প্লেটো ও এ্যারিস্টটলও চাননি, কিন্তু তাদের আয়োজনটা ছিল ইহজাগতিক, ব্রাহ্মণেরা ব্যবস্থা করেছেন তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার। ব্রাহ্মণেরা নিজেরা কিন্তু বেশ ইহজাগতিক ছিলেন, উৎপাদন করতেন না, পূজা-অর্চনার উপর নির্ভর করতেন, এবং ভোগের ব্যাপারে যে উৎসাহহীন ছিলেন, তাও নয়।

ভারতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিদ্যা অগ্রসর ছিল। ওই জ্ঞান মোটেই আধ্যাত্মিক ছিল না। ছিল পরিপূর্ণরূপে ইহজাগতিক ও বস্তুবাদী।

> *কিন্তু বিজ্ঞান কেন এগুলো না, চিকিৎসা বিদ্যা কেন পিছিয়ে গেল? গেল ইহজাগতিকতার সাথে ব্রাহ্মণদের শত্রুতার কারণে। শত্রুতাটা ছিল প্রধানতঃ মতাদর্শিক। প্রচার করা হয়েছিল জগৎ মিথ্যা, মায়া। তাই যদি হয়, তাহলে বিজ্ঞান এগুবে কি করে?*

বিজ্ঞান তো মায়া নয়, সে তো বস্তুবাদী। চিকিৎসার ক্ষেত্রে একই রকমের ঘটনা ঘটেছে। রোগের নিরাময় দেবতারা করবেন, করবেন পূজা-অর্চনার বিনিময়ে, এবং পূজা-অর্চনা ঘটবে ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতায়, ব্যবস্থাটা ছিল এই রকমের। মন্ত্র অনেক জরুরী ছিল ভেষজ ঔষধের তুলনায়। প্রচারণা ছিল এটাই। মতাদর্শিকভাবে শ্রমকে হেয় জ্ঞান করা হয়েছে। শ্রম হচ্ছে অভিশাপ, শ্রম করবে শূদ্র। সব ধরণের শ্রমকেই ইতর লোকের কাজ বলা হয়েছে। চাষা, কামার, কুমার, ডোম, মেথর কারো শ্রমই মর্যাদাবান নয়। বিজ্ঞানীদের কাজও ছিল মর্যাদাহীন, চিকিৎসকের কাজও তাই। কর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন আদর্শস্থানীয়। লোকে তাদের মত পরশ্রমজীবী হতে চেয়েছে পরিশ্রমজীবী না হয়ে। বিজ্ঞান রূপকথা নয়, সে প্রায়োগিক। বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারে তারাই যারা উৎপাদনে যুক্ত; কিন্তু ভারতবর্ষে উৎপাদনে যারা যুক্ত তাদের খাটনো হয়েছে ঘানির বলদ হিসেবে; তারা কি করে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে নব নব উদ্ভাবনের পথে? প্রয়োজনই উদ্ভাবনের জন্ম দেয়, সে প্রয়োজনটা তৈরী হয় নি। বিজ্ঞানের জায়গায় এসেছে ঈশ্বর নির্ভরতা, পরলোক বড় হয়ে উঠতে চেয়েছে ইহলোককে পিছনে ঠেলে।

> *আমাদের সংস্কৃতিতে এখনো দেখা যায় যে, বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মৌলবাদী হন; এর প্রধান করাণ ওই বস্তু জগৎবিচ্ছিন্নতা। বিজ্ঞান তাদের কাছে ঐন্দ্রজালিক বস্তুতে পরিনত হয়। সেখানে অংক থাকে, অংক মন্ত্রের মতো ভাববাদী, বস্তুবাদী না হয়ে। মৌলবাদী বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা দেখেন এবং ভাবেন এ সবই একটি অনির্বচনীয় পরম সত্তার বহিঃপ্রকাশ, সবটাই যে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণের মধ্য দিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে সেই সাধারণ সত্যটি তাঁরা ভুলে যান।*

ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রাচীন ভারতে দার্শনিক অভ্যুত্থান ঘটেছে, যার সামাজিক তাৎপর্য মোটেই সামান্য ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ও বিকাশ খুবই বড় একটি ঘটনা। বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের শাসন অনুশাসন মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারা নাস্তিক ছিলেন, ঈশ্বর কিংবা সর্গে বিশ্বাস করতেন না; যেটা মস্ত বড় ব্যাপার। কিন্তু বৌদ্ধরা তাই বলে যে পুরোপুরি ইহজাগতিক ছিলেন তাও নয়। তাঁরা কর্মফল ও জন্মচক্র মানতেন। ব্রাহ্মণদের মত মোক্ষ

চাইতেন না বটে, কিন্তু নির্বান চাইতেন। নির্বান হচ্ছে নিভে যাওয়া, নির্বাপিত হওয়া। এই যে নির্বাপিত হতে চাওয়া, এর মধ্যে ইহজগৎবিমুখতা ছিল। জীবনকে তারা দুর্ভোগ হিসেবে দেখতেন, এবং জীবনের প্রতি আসক্ত হওয়াটাকে চূড়ান্ত ভ্রম মনে করতেন। তাঁরা নাস্তিক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু জীবনবিমুখও ছিলেন। জীবনবিমুখদের পক্ষে ইহজাগতিক হওয়া কঠিন। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের বিতারিত করেছে বটে, কিন্তু বুদ্ধকে বিষ্ণু-র অবতার হিসেবে মানতে অসুবিধাবোধ করেনি।

> *প্রাচীন ভারতের পুরোপুরি ইহজাগতিকরা চার্বাক নামে পরিচিত। এঁরা একাধারে নাস্তিক, ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী এবং জগতের প্রতি আসক্ত। ভারতীয় দার্শনিক ধারায় এঁরাই ছিলেন সর্বাধিক পরিমান বস্তুবাদী। একেবারেই আপোষহীন।*

চার্বাকরা চার্বাক নাম কেন পেলেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ আছেন যারা এঁদের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। কিন্তু চার্বাকরা যে ছিলেন তার বহু প্রমাণ আছে। তবে তাঁদের নিজেদের রচনা পাওয়া যায় না, কারণ ব্রাহ্মণদের ক্রোধ। ব্রাহ্মণরা তাঁদের নাস্তিক, পাষ্ণড, ধূর্ত, কূটতার্কিক, ছেলেমানুষ ইত্যাদি নানান অভিধায় ভূষিত করেছেন, তিরস্কার করার অভিপ্রায়ে। বোঝা যায় খুবই ক্ষিপ্ত ছিলেন। অবজ্ঞা করে জব্দ করা যয়নি, তাই আক্রমন করা হয়েছে। চার্বাকদের গ্রন্থ নয় কেবল, সম্পত্তি ও জীবন উভয়েই বিপন্ন ছিল বলে ধারণা করার কারণ রয়েছে। চার্বাকদের নামকরণ সম্বন্ধে ঠাটটাচ্ছলে বলা হয়েছে যে, তারা চারুভাষণ করতো, তাই চার্বাক ছিল। চারুভাষণ অর্থ এ ক্ষেত্রে কটুভাষণই মনে হয়। চার্বাকরা সবকিছুই চর্বন করতো, অনেকটা ছাগলের মতো, তাই চার্বাক, এমন কথাও বলা হয়েছে। চার্বাকদের আরেক নাম লোকায়াত। দেবীপ্রসাদ চট্টপাধ্যায় এনিয়ে গবেষণা করেছেন, এবং তিনি এ লোকায়াত নামকরণ পছন্দ করেন। চার্বাক দর্শন আসলে লোকায়াত দর্শনই। একাধিক অর্থে। এ ছিল লোকদের আয়ত্বে। এই দর্শনে রয়েছে সাধারণ মানুষের ধারণা, জীবন ও জগৎ বিষয়ে। অন্যদিকে আবার সে ছিল ইহজাগতিক। কেবল ইহজাগতিক নয়, পরিপূর্ণরূপে বস্তুবাদী।

চার্বাকরা ব্রাহ্মণদের আধিপত্য মানে না। ব্রাহ্মণদের আধ্যাত্মিকতাকে মনে করে প্রতারণা। ব্রাহ্মণেরা শ্রম করে না, অন্যেরটা খায়, তাই পূজা-অর্চনা প্রথা অনুষ্ঠানকে উচ্চে তুলে ধরে। ওই পথেই তাদের জীবিকা অর্জিত হয়। তারা যে শোষক শ্রেনীর অংশ, এবং শোষনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার কারিগর, এই ধারণাটা সম্ভবত তখনও আসে নি, তাই কেবল প্রতারকই বলা হয়েছে।

চার্বাকরা বৌদ্ধদের মত নাস্তিক বটে, স্বর্গ নরক মানে না; তবে তারা আরও একধাপ অগ্রসর, কেননা কর্মফলকেও তারা মিথ্যা মনে করে। জন্মান্তর নেই। মৃত্যুর পরে দেহ যখন পুড়ে ছাই

হবে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা আত্মা বলে কিছু নেই। হ্যা চৈতন্য আছে, কিন্তু চৈতন্যর জন্য আত্মার প্রয়োজন নেই। মাটি, আগুন, পানি ও বায়ুর সংমিশ্রণে আমাদের দেহ তৈরী হয় এবং চৈতন্য ওই সংমিশ্রনেরই ফল। পাপ পুন্য কর্মফল পুনর্জন্ম এসবই ধূর্ত ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যাচার। যা প্রত্যক্ষ শুধু তাই সত্য, এই তাদের বিশ্বাস। শরীর থাকলে যেমন প্রাণ থাকে, তেমনি চৈতন্যও থাকে। সুখ নিজেই মূল্যবান; এবং সেই সুখ ইহকালেই পাওয়া যাবে, পরকালের জন্য অপেক্ষা করাটা মূর্খতা, কেননা তার তো কোন অস্তিত্বই নেই আসলে। দৈহিক আনন্দই ঈপ্সিত। যে জন্য বলা হয় যে, খাও দাও ফুর্তি করো, ধার করে হলেও ঘি কেনো, এটাই তাদের নীতি ছিল। যেন ফুর্তিবাজের দল।

চার্বাকদের বক্তব্যকে এভাবে ফুর্তিবাজি বলে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। কেননা সরাসরি তাদের গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যরা তাদের সম্পর্কে যা বলেছে তা থেকেই তাদের বিষয়ে ধারণা করতে হয়েছে। তাদের বক্তব্যের খন্ডন পাওয়া যায়, মূল বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে বুঝতে কষ্ট নেই যে, তারা বিদ্রোহী ছিলেন। রাজবিদ্রোহী নয় হয়তো, কিন্তু সমাজবিদ্রোহী অবশ্যই এবং বিদ্রোহে যে প্রবলতা থাকে সেটা সম্ভবত ছিল তাদের মধ্যেও, অথবা হতে পারে যে, তাদের কথাকে অতিশয়োক্তির সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে, ব্রাহ্মণরাই করেছেন, চার্বাকদের যুক্তিহীন বলে চিহ্নিত করার অভিপ্রায়ে।

> *এই লোকায়তিকদের অপরাধটা তো সামান্য নয়। এরা বেদ মানে না, এবং শুধু যে না মেনে ক্ষান্ত হয় তা নয়, বলে যে বেদ মিথ্যা, স্ববিরোধী এবং অতিরঞ্জিত। আরো বড় মুশকিল এই যে, এদের কথা সাধারণ লোকে বিশ্বাস করবে। কেননা কথাগুলো সরল। ব্রাহ্মণেরা যে ভন্ড ও প্রতারক, তারা যে স্মৃতি শ্রুতির ব্যবসা করে এটা তো প্রমানের অপেক্ষা রাখে না, লোকে স্বচক্ষে দেখে।*

তাছাড়া সাধারণ মানুষ হিংসুটে, তারা ব্রাহ্মণদের সুখ সহ্য করতে পারে না। চার্বাকরা তাই বিপজ্জনক বৈকি। তারা ব্যক্তির নয়, গোটা ব্যবস্থার সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত। তাই ব্যবস্থাটা একত্রযোগে তাদেরকে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে চার্বাক নামে এক রাক্ষসের উল্লেখ রয়েছে। লোকায়তের উল্লেখ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও পাওয়া যাবে। পৌরাণিক উপাখ্যানে বলা হয়েছে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা সুবিধা করতে পারছে না দেখে দেবগুরু বৃহস্পতি এক বুদ্ধি বের করেছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে অসুরদের সঙ্গে মিশে গেছেন এবং তাদেরকে চার্বাক দর্শন অর্থাৎ ফুর্তি করার মতবাদ শিখিয়াছেন। এতে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে। অসুররা শক্তি হারিয়েছে এবং দেবতারা জয়ী হয়েছে। মনে হচ্ছে এখানে দেবতা বলতে ব্রাহ্মণকে বুঝতে হবে, অসুর বলতে বুঝতে হবে শূদ্রকে।

রামায়নে রাম ভ্রাতা ভরতকে রাজকার্য পরিচালনার বিষয়ে নানাবিধ মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। একটা পরামর্শ ছিল এই যে, ভরত যেন লোকায়াত ব্রাহ্মণদের সেবা না করেন। লোকায়তিকরা ধর্মশাস্ত্র অবজ্ঞা করে, আর অর্থহীন বচসায় লিপ্ত হয়। রাম আদর্শ পুরুষ, তিনি ভদ্র ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু যা বলেছেন তা অত্যন্ত দৃঢ়। চার্বাকরা মূর্খ, তারা বচসাপ্রিয় এবং নাস্তিক। নাস্তিক অর্থ অবিশ্বাসী, চার্বাকরা বেদ-ব্রাহ্মণে বিশ্বাস করে না। তাদের ওই নাস্তিকতার অর্থ দাঁড়ায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যে-বিদ্রোহ কোন মতেই সমর্থনীয় নয়, প্রশ্রয় দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

এসব গেল নেতিবাচক বিরোধিতা। ইহজাগতিকতার বিরুদ্ধে বিকল্প দাঁড় করিয়েও বিরোধিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই বিকল্প হচ্ছে মায়াবাদ। শঙ্করাচর্য যা অত্যন্ত বেগবান উপায়ে প্রচার করেছেন।

ইহজাগতিকতার সঙ্গে শত্রুতা তাই নতুন কিছু নয়। এই শত্রুতা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুবিধাভোগী মানুষেরা করেছে। ব্যক্তিও করেছে। দুই কারণে। একটি হচ্ছে মতাদর্শিক পরিমন্ডলে আধিপত্য রক্ষার অভিপ্রায়ে। অন্যটি হচ্ছে ব্যক্তিগত ভীতি। ইহকালে তো কোন সুখ নেই, পরকালেও যদি তা না পাওয়া যায় তবে উপায়টা কি? ব্যক্তি তাই পরলোকে সুখ ও সুবিচার প্রাপ্তির আশাটকে জোরেসোরে আঁকড়ে ধরেছে। ব্যক্তি একটি বিশ্বাসের জগৎ নিজের জন্য তৈরী করে নেয়, সেটা ভেঙ্গে পড়লে সে খুবই বিপদে পড়ে।

৩

চীনের কনফুসিয়াস প্রাচীন বিশ্বের নাগরিক। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ তিনি। চীনের লোকেরা কথা বলে কম, কনফুসিয়াস বলতেন আরো কম। খুব সংযতভাব ছিল তাঁর। যা বলবার শিষ্যদের বলে গেছেন, এবং বলেছেন অল্প কথায়। সাজানো কথা এবং মন ভোলানো ব্যবহার যাদের অভ্যাস, তারা সদ্গুণসম্পন্ন নয় বলেই তাঁর সন্দেহ। সেজন্য তাঁর বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

মানুষের জীবনকে যে তিনি খুব উচ্চমূল্য দিতেন তা নয়। একদা ঝর্ণাতলায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন সবকিছুই ওই ঝর্ণার মত ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু শব্দমুখর। তবু মানতেই হবে যে,

কনফুসিয়াসের সমস্ত চিন্তাই ছিল ইহজগৎ নিয়ে, পরজগৎ সম্পর্কে তাঁর উপদেশ ছিল খুবই স্পষ্ট। তাঁকে নাস্তিক বললে অন্যায় হবে না। কোন

সংগঠিত মতবাদ প্রচার করেননি, তেমন কিছুতে বিশ্বাসও করতেন না। বৌদ্ধদের সঙ্গে তার মিল রয়েছে, কিন্তু দূরত্বটাও সামান্য নয়। জীবন সম্পর্কে বৌদ্ধদের মধ্যে যে রকম বৈরাগ্য ছিল, কনফুসিয়াসের তা ছিল না। তিনি সম্পূর্ণরূপে জীবনবাদী।

নির্বান চান না, জীবনকে সুন্দর করতে চান। বস্তুত সুন্দর জীবনই তার লক্ষ্য। কিন্তু আবার স্থুলভাবে ভোগবাদীও নন। সর্বক্ষেত্রে সংযমের সমর্থক। শিষ্যদের বলেছেন, কথা বলবে বুঝে শুনে। যা দেখার নয় তা দেখবে না, যা শোনার নয় তা শুনবে না, যা করার নয় তা করবে না। একেবারেই অপচয়বিমুখ।

কনফুসিয়াসের উপদেশাবলী ইহজাগতিকতায় ভরপুর। একবার তিনি মরাণাপন্ন হয়েছিলেন। সঙ্গীরা জিজ্ঞেসা করছিল প্রার্থনা করছেন কিনা। অত্যন্ত সংক্ষেপে কনফুসিয়াস বলেছেন, আমি তো দীর্ঘদিন ধরেই প্রার্থনা করছি। বলতে চাইছেন সৎ জীবনযাপনই হচ্ছে প্রার্থনা, এর বাইরে কোন আনুষ্ঠানিকতা অনাবশ্যক। তাঁর জন্য পুরোহিত নেই। ধর্মগৃহ নেই। মন্ত্র অনাবশ্যক। জীবনযাপনকেই নৈতিকভাবে উন্নত করা চাই, সেটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। জিজ্ঞেস করা হয়েছিল পরকাল সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কি। জবাবে বলেছেন, জীবিতদের প্রতি তোমার কর্তব্য কি শেষ করেছ যে তুমি মৃতদের প্রতি কর্তব্যের কথা ভাবছো? বলেছেন আগে জীবনকে বুঝতে হবে, তবেই না মৃত্যুকে বোঝার ব্যাপারে চিন্তা করা যাবে।

কনফুসিয়াসের সব বক্তব্যই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। সে ব্যক্তি রাজা হোক কিংবা সাধারণ মানুষ হোক। সদ্গুনকে বিকশিত করা চাই, সন্মান অর্জনই শ্রেয়। সন্মানিত ব্যক্তি নিজের চরিত্রের কথা ভাবে, নিম্নস্তরের ব্যক্তি ভাবে তার পদের কথা। সন্মানিত ব্যক্তি সুবিচার চায় আর নিম্নস্তরের ব্যক্তি চায় করুণা। পদের জন্য লালায়িত হওয়াটা ভুল, পদের যোগ্য হওয়াটা কাম্য। এদিকে ঝুঁকবেনা, ওদিকেও ঝুঁকবেনা, সদা সৎ পথে চলবে। নীতিবানদের সাথে চলবে, নীতিহীন দের থেকে দুরে থাকবে। সৎ পথ চেনে অথচ সেই পথে চলে না যে ব্যক্তি সে একজন কাপুরুষ। তাকেই পরোপকারী বলা যাবে যে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্যদের রক্ষা করে, নিজেকে বিকশিত করতে গিয়ে অন্যকে বিকশিত করে।

কনফুসিয়াসের এসব বক্তব্যে গভীর দার্শনিকতা রয়েছে, ইহজাগতিকতাও; কিন্তুএতে দ্বন্দ্বের কথাটা নেই। বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো থাকবে, তাদের মধ্য থেকেই ব্যক্তি বিকশিত হবে, আবনত অবস্থাতেই উন্নতি করবে; এই বক্তব্য প্রকৃত ইহজাগতিকের নয়, ধর্মবাদীর বটে। ইহজাগতিকতাও যে ইহজাগতিকতার সঙ্গে শত্রুতা করতে পারে কনফুসিয়াসের মতবাদ মনে হয় তারই একটি নিদর্শন।

তাঁর মতবাদ অত্যন্ত শক্তিশালী। বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত চীনে কনফুসিয়াস খুবই সন্মানিত ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে চীনে কনফুসিয়াসের সামন্তবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সামন্তবাদের যুগে সামন্তবাদী মনোভাব অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু ওই মনোভাব যখন দার্শনিক প্রত্যয় হয়ে দাঁড়ায় এবং সকল যুগের জন্য স্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে প্রযুক্ত হতে চায় তখনই বিপদ বাঁধে। চীনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ব্যবস্থা এখন আর শক্তিশালী নেই; দেখা যচ্ছে এই দুর্বলতার অবকাশে কনফুসীয় মতবাদ আবার প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। মৌলবাদের উত্থানে উদ্বিগ্ন ইউরোপ আমেরিকার বিদ্যান মহল লক্ষ্য করেছেন যে চীনে নানা ধরনের জীবন-বিরোধী মতবাদের সঙ্গে কনফুসিয়াসের মতবাদও জায়গা করে নিচ্ছে। কেবল চীনে নয়, দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও।

কনফুসিয়াসের বক্তব্যগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, উচ্চতর বিষয়ে আলোচনা নিম্নস্তরের লোকদের সঙ্গে করা ঠিক নয়, তারা ওসব বুঝবে না। যারা গড়পড়তা নয়, তারাই কেবল দার্শনিক আলোচনার যোগ্য। সাধারণ মানুষের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গিটা তাৎপর্যহীন নয়। এটি প্রাচীন ব্রাহ্মণদেরও ছিল।

৪

গ্রীক দার্শনিকেরাও শ্রেনী আধিপত্যের বিপক্ষে ছিলেন না। তাঁদের দেশে দার্শনিকেরা দর্শন নিয়ে ভাব্বার সময় ও সুযোগ পেতেন দাস শ্রম থাকার কারণে। দাস ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় দর্শন চর্চাও বিপদ্গ্রস্ত হয়েছে। সেকালে তত্ত্বজ্ঞান একচেটিয়া বিত্তবানদের অধিকারের মধ্যে ছিল।

ইউরোপের মধ্য যুগেও জ্ঞান সাধারণ মানুষ পায়নি। এবং সব জ্ঞান বাইবেলে আছে এই মত কর্তৃত্ব করেছে। রেনেসাঁসের কালে বড় বড় অর্জন সম্ভব হয়েছে; তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ঈশ্বরবাদিতার জায়গায় মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিমাত্রই গুরুত্বপূর্ণ এই বোধটি তখন তৈরী হয়েছিল; জ্ঞানে সাধারণ মানুষের আধিকার স্বীকৃতি পায়েছিল, বিশেষ ভাবে দেশে দেশে মাতৃভাষার চর্চার ভেতর দিয়ে। বাইবেল সাধারণ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এসব ছিল ইহজাগতিকতার সম্প্রসারণ। চিত্রকলার ক্ষেত্রে মানুষ চলে এসেছিল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে।

কিন্তু একটা সীমা ছিল। ধর্ম যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে তা নয়, তার তৎপরতা ছিল। আর ছিল শ্রেনী। ইহজাগতিকতা যেমন ধর্মের বিভাজন মানতে চায় না, তেমনি শ্রেনী বিভাজন

তার পছন্দ নয়, কেননা মানুষকে পাপ-পুন্যের বিচারে যেমন বিভক্ত করতে সে অসম্মত, তেমনি অনুৎসাহী সে মানুষকে ধন-সম্পত্তির নিরিখে চিহ্নিত করতে, যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে ইহজাগতিকতার যে অনীহা রয়েছে এমন বলা যাবে না। শ্রেনী দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে কাজ করে তা ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথারের কাজের মধ্যেপ্রমাণিত। লুথার ল্যাটিন বাইবেল;এর জার্মান অনুবাদ করে একটি বৈপ্লবিক কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, তার ওই ভাষা ধ্রুপদী জার্মান ভাষাও ছিল না, ছিল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। কিন্তু তিনিই আবার জার্মানীতে কৃষক বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন। স্ববিরোধিতা নয়; এ হচ্ছে দুই বিপরীত উপাদানের সহ-অবস্থান।

> *রেনেসাঁসের উজ্জ্বল মানবতাবাদের মধ্যে সবকিছুই যে উচ্চ নৈতিকতাগুণসম্পন্ন ছিল তা কিন্তু নয়। ছিল মেকিয়াভেলীর দৃষ্টিভংগীও। বাস্তববাদী নিকোলো মেকিয়াভেলী রাজার পক্ষে ছিলেন, জনগণের পক্ষে নয়। রাজাকে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন সিংহের মত সাহসী এবং শৃগালের মত ধূর্ত হবার।*

দুটোর একটি হলে চলবে না , দুটোই হওয়া চাই, এবং একটি অপরটিকে নাকচ করে দিচ্ছে তা নয়; দুটোই কাজে লাগবে, দুই বাহুর মতো, যখন যেমন, তখন তেমন। মেকিয়াভেলী কনফুসিয়াসের তুলনায় অনেক বেশী ভাষণপ্রিয়, এবং প্রায় আগ্রাসী রূপেই ইহজাগতিক। কিন্তু তিনি আবার ইহজাগতিকতার সঙ্গে শত্রুতাই করেন যখন রাজার বিপক্ষে দাঁড়ান, বিরোধী হন জনস্বার্থের। রাজস্বার্থ রক্ষার প্রণোদনায় মেকিয়াভেলি ধর্মকেও ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত নন। তিনি বিশ্বাসগুলো ভ্রান্ত হতে পারে, এবং প্রায়শই ভ্রান্ত এআও ঠিক, তবু রাজার কাজ হবে সেগুলোকে রক্ষা করা। কেননা জনগণ ওগুলোতে আস্থা রাখে। রাজার পক্ষে রাষ্ট্রধর্মের প্রতিপালক হওয়া খুবই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রাজনীতির স্বার্থে মেকিয়াভেলী জেনেশুনে বিজ্ঞান তথা ইহজাগতিকতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। বলারা অপেক্ষা রাখে না, সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ওই ধরনের নিষ্ঠুর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সাসক শ্রেনী এখনও করে যাচ্ছে।

প্রথমে কোপার্নিকাস, পরে গ্যালেলীও সৌরজগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদলে দিয়েছেন, এবং বিশেষভাবে বিপদে ফেলেছেন ধর্মাশ্রয়ী পুরোহিতদের। বাইবেল বলছে পৃথিবীই রয়েছে কেন্দ্রে, সূর্য তার চারিদিকে অবিশ্রাম ঘুরছে ; অথচ ওই জ্যোতির্বিদরা প্রচার করছেন উলটো তত্ত্ব; যাতে করে লোকের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। কোপার্নিকাসের তেমন বিপদ হয়নি, কিন্তু গ্যালেলীওর প্রাণ সংশয় দেখা দিয়েছিল। দূই কারণে। প্রথমত গ্যালেলিও যে কেবল বাইবেলের ধারণাকেই বিপদ্গ্রস্ত করেছিলেন, তা নয়। তার লেখা এমনই বিস্তৃত, প্রামান্য ও যুক্তিবুদ্ধিভিত্তিক, যে কার্যত তিনি প্রকৃতিবিদ্যা থেকে সব রকমের আধ্যাত্মিকতাকেই নির্বাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন।প্রকৃতি হয়ে

দাRাচ্ছিল একটা ঘৃড়ির মতো, যেটা কারো ইচ্ছায় চলে না, চালু থাকে আপন বৈজ্ঞানিকতায়। দ্বিতীয় ব্যাপার এই যে, গ্যালেলিও ল্যাটিন ভাষায় লেখেন নি, তাঁর তত্ত্বকে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন জনবোধ্য ইতালিয়ান ভাষাতে; যা তার মাতৃভাষাও বটে। এতে বিপদ বেড়েছে। আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, জনসাধারণ জেনে ফেলবে যে ধর্মব্যবসায়ীরা এতদিন যা তাদেরকে শিখিয়ে এসেছে তার অন্ততঃ একাংশ ভ্রান্ত, আর তাই যদি হয়, একাংশ যদি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিতই হয় তাহলে অন্য অংশ যে অভ্রান্ত তাই বা বলা যাবে কোন ভরসায়? ফলে ব্যবসা যাবে চলে, অরাজগতা দেখা দেবে, কেউ কাউকে মানবে না। ধর্মীয় বিচারালয় তাই গ্রেফতার করেছে গ্যালেলিওকে, তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য করেছে এই ঘোষনা দিতে যে তার ধারণা ভুল, এবং তাই তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর তত্ত্ব প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন।

ব্রুনো কিন্তু অতটা সৌভাগ্যবান ছিলেন না। তিনি ধর্মীয় আদালতের হাতে ধরা পড়েছেন এবং তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ব্রুনো মোটেই নাস্তিক ছিলেন না, তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ধর্মজাজক হিসেবেই। কিন্তু সেখানে থাকতে পারেননি। ঘুরে ঘুরে জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন এবং তা প্রচার করেছেন। কিন্তু সেখানে থাকতে পারেননি, ঘুরে ঘুরে জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন এবং তা প্রচার করেছেন। এই যে প্রচার করাটা ধর্মব্যবসায়ীদের পছন্দ হয়নি। তারা পেছনে লেগেছে। আসলে ব্রুণোর চিন্তাকে সহ্য করা প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্রুনোকে তাই প্রাণ দিতে হয়েছে। দেবার চূড়ান্ত কারণ এই যে, তিনিও সক্রেটিসের মতই অনমনীয় ছিলেন, আপোষ করেননি। প্রাণদন্ডাদেশ শুনে ব্রুনো তাঁর বিচারকদের বলেছিলেন, ‘আমার সন্দেহ যে তোমরা যারা এই আদেশ দিচ্ছ তারা আধিক সন্ত্রস্ত আমার চেয়ে, যার ওপর এই আদেশ জারি করা হচ্ছে।’ বিচারকরা যে ভয়ের দরুণ ওই মৃতূদন্ডাদেশ দিয়েছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ভয়টা স্বার্থহানির।

ইউরোপে দর্শন চর্চার ইতিহাসের অগ্রগতির স্তর গুলোতে দেখবো যে বেকনের ইহজাগতিকতাকে পরবর্তীকালে হবস, লক এবং আরো পরে মার্কস এগিয়ে নিয়ে গেছেন। অপরদিকে ভাব্বাদিতা এগিয়েছে দেকার্ত, কান্ট ও হেগেলের কাগের ভেতর দিয়ে। কিন্তু বস্তুবাদিতায় আস্থা রেখেও হবস মনে করতেন যে, রাষ্ট্রের স্বার্থের যদি প্রয়োজন হয় তবে রাজা তার সার্বভৌম ক্ষমতা বলে প্রচলিত কুসংস্কারগুলোকে একটি ধর্মমত হিসেবে দাড় করাতে পারেন, সে অধিকার তাঁর আছে। আর যে ভলতেয়ার তাঁর যুক্তি-বুদ্ধির জন্য ফরাসী বিপ্লবের স্থপতিদের একজন হিসেবে স্বীকৃত তিনিও বলেছেন যে, চাষীরা যাতে খাজনা দেয় এবং ওপরওয়ালাদের কথা শোনেসে জন্য তাদেরকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে রাখার আবশ্যকতা রয়েছে। অপরদিকে হেগেল তো দর্শনকে পরম সত্ত্বার দিকেই নিয়ে গেছেন, এবং প্রকারান্তরে একনায়কত্বের দার্শনিক যৌক্তিকতাও সরবরাহ করেছেন।

৫

ইসলামী দর্শনে যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে **মোতাজিলা** সম্প্রদায় দ্বারা অনেকগুলো যুক্তিভিত্তিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এঁরা সবাই বিশ্বাসী ছিলেন, যদিও কাউকে কাউকে ধর্মদ্রোহী বলে মনে করা হয়েছে। মোতাজিলাদেরকে মোতাজিলা নামে অভিহিত করার মধ্যেও তাদের প্রতি অবিশ্বাসের চিহ্ন রয়েছে। মোতাজিলা শব্দের অর্থ যিনি বিচ্ছিন্ন হয়েছেন; ওই নামকরনের অর্থ তাই দাঁড়ায়, এঁরা বিচ্ছিন্ন হয়েছেন ধর্মচর্চার মূলধারা থেকে, এবং ধর্ম বিষয়ে নিজেদের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

মোতাজিলারা গ্রীক দর্শন মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন। এ্যারিস্টটল ছিলেন তাদের জন্য বিশেষ আগ্রহের কেন্দ্র, প্লেটোকেও তারা জানতেন, প্লেটোর সাথে খ্রিষ্টান চিন্তার সম্পর্কের ভিতর দিয়ে যে নব্য প্লেটোনিক মতবাদ গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গেও এঁদের যোগাযোগ ছিল। গ্রীক দর্শনকে নতুন ইউরোপে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে মোতাজিলারা মাধ্যম হিসেবেও কাজ করেছেন। তাঁদের মনে অনেকগুলো প্রশ্ন জেগেছিল। একটা প্রশ্ন কোরানের অনাদ্বিত্ব নিয়ে। কোরাণ আল্লাহর সৃষ্টি; তাই কোরাণ যদি অনাদি হয়, যদি তার আদি না থাকে, তাহলে সৃষ্টি ও স্রষ্টা তো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, একের জায়গায় দুইকে পাওয়া যাচ্ছে, একত্ববাদের জায়গায় দ্বৈতবাদ তৈরী হচ্ছে। তাই তারা বলতে চেয়েছেন যে, কোরাণ নিত্যকালের নয়, এটি একটি বিশেষ সৃষ্টি, এবং সৃষ্টি যেহেতু, তাই তার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। আর ব্যাখ্যা করার মত যে যুক্তি-বুদ্ধি আল্লাহই মানুষকে দিয়েছেন তা, মানুষের পক্ষে তা প্রয়োগ না করা অন্যায়। একইভাবে জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারেও তার প্রশ্ন রয়েছে। আল্লাহ চাইলেন তাই জগৎ সৃষ্টি হল, জগতে মানুষ এলো। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন কেন, চাইবেন কেন? তিনি তো সয়ংসম্পূর্ণ, তাঁর তো ইচ্ছা করার মতো অসম্পূর্ণতা নেই। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর বহুবিধ গুন সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বহুবিধ গুন সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আল্লাহর কোন একটি গুণকে আলাদা করে উল্লেখ করা মানেই তিনি যে সর্বগুন সম্পন্ন সেই সত্যকে অস্বীকার করা। আবার যখন কোন গুনের উল্লেখ করা হয়, তখন ধরে নেওয়া হয় নাকি যে, ওই গুণ তার মধে না থাকাও সম্ভব ছিল? যেমন যখন বলা হয় যে, তিনি করুণাময়, তখন ওই বলার পেছনে এই মনোভাব কি প্রকারন্তরে থাকে না যে, তাঁর পক্ষে করুণাময় না হওয়াটাও অসম্ভব ছিল না? কেননা সংজ্ঞা দিতে যাওয়া মানেই হল নেতির সৃষ্টি করা, সীমাবদ্ধতা তৈরী করা, যেমন আলোর কথা অর্থ অন্ধকার বলে একটি বস্তু আছে এটা স্বীকার করে নেওয়া। আল্লাহ হচ্ছেন এক ও অভিন্ন, তাই তার বহুগুণ কল্পণা করা এক ধরনের পৌত্তলিকতা বলেই মোতাজিলারা মনে করেন।

মোতাজিলাদের মূল আগ্রহটা ছিল বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিবুদ্ধির সমন্বয় ঘটানো। যুক্তিবুদ্ধিকেই তারা জ্ঞানের মূল উৎস মনে করতেন এবং তার সাহায্যে বিশ্বাসের যে জগৎ রয়েছে তাকে বিশ্লেষণ করে যুক্তিসিদ্ধ করে নিতে চেয়েছেন। ধর্ম ও জগৎকে আলাদা করার যে ইহজাগতিকতা সেটা আরো পরে এসেছে। ইউরোপীয় রেনেঁসাসের সময়ে। মোতাজিলারা রেনেঁসাসকে সাহায্য করেছেন, কিন্তু ওই মতাদর্শিক বিশ্বের অধিবাসী ছিলেন না।

তাঁদের চেষ্টাটা বিচ্ছিন্ন করণের ছিল না, ছিল সমন্বয়ের। তাঁরা দেখেছেন যে, এ্যারিস্টটল বলছেন জগৎ অনাদি, কেউ তাকে সৃষ্টি করেনি, সে আপনাপনি তৈরী হয়েছে; অথচ কোরান বলছে যে, আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা, জগতেরও। তাহলে? সমস্যাটির সমাধান কি? মোতাজিলারা একটি সমাধান বের করেছেন। সেটি এই যে, জগৎ অনাদি বটে, আবার সৃষ্টও বটে। জগৎ অনাদিকাল থেকেই ছিল, কিন্তু মৃত অবস্থায়, আল্লাহ সেই মত জগতে গতির সঞ্চার করেছেন, যার ফলে সে প্রাণ পেয়েছে অর্থাৎ সে সৃষ্টি হয়েছে। মোতাজিলারা বলতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেই স্বাধীনতার ফলেই মানুষ কাজ করে, এবং কখনো কখনো নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী থাকে না; তাই আল্লাহ তাকে শাস্তিও দিতে পারেন না। শাস্তি দেওয়াটা হবে আল্লাহর পক্ষে অযৌক্তিক। মোতাজিলারা আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব বলে মনে করেন না। কেননা আল্লাহ হচ্ছেন নিরাবয়ব, তাঁর পক্ষে কোন নির্দিষ্ট অবয়ব নেওয়া সম্ভব নয়।

মোতাজিলাদের প্রশ্নাবলী ও বক্তব্য মূলধারার লোকেরা মোটেই পছন্দ করেনি। সাধারণ লোকও করেনি, কেননা তারা বিশ্বাস করতে পছন্দ করে, জিজ্ঞাসা করা বাদ দিয়ে। আব্বাসীয় শাসনামলে, বিশেষ করে খলিফা আল-মামুনের সময়ে, মোতাজিলারা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। মামুন আঈন করে মোতাজিলা মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু সফল হননি। সাধারণ মানুষ মোতাজিলাদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। কিছুটা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের প্রচারের দরুন, কিছুটা যুক্তি ও সংশয়ের চাইতে বিশ্বাসের ব্যাপারে তাদের স্বাভাবিক আগ্রহের কারণে। যে-দার্শনিকেরা ছিলেন প্রথা সমর্থক, তারাই শেষ পর্যন্তজয়ী ও স্থায়ী হয়েছেন।

যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা যারা পরিচালিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগন্য হচ্ছেন ইবনে সিনা। তিনি কেবল দার্শনিক নন, বিজ্ঞানীও ছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ তিনি নিজের উদ্যোগে তৈরী করেছিলেন। তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে। ইবনে সিনা রচিত *'কানুন'* নামের গ্রন্থটি ল্যাটিনে অনূদিত হয়েছিল এবং তা মধ্যযুগের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচিত হতো।

ইবনে সিনা বিশ্বাস ও যুক্তিবুদ্ধির মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেননি, কারণ তাঁর ধারণা সমন্বয় সম্ভব নয়। দর্শনকে তিনি গুরুত্ব দিতেন এবং মনে করতেন যে, দর্শন ধর্মের অধীনে বিকশিত হয়নি, তার বিকাশ ঘটেছে স্বাধীনভাবে। দর্শন জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল; জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে আসে, কিন্তু ওই জ্ঞান পরিপূর্ণ হয় যৌক্তিক বিবেচনার মধ্য দিয়ে। সাধারণ মানুষ শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনাই দেখে, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগসূত্র দেখতে পায় না, যোগসূত্র আবিস্কার দর্শনের কাজ। ইবনে সিন বস্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে প্রাসঙ্গিক মনে করেননি, আল্লাহ সব কিছুর উর্ধ্বে, তিনি আধ্যাত্মিক এবং বস্তুজগতের অনেক ওপরে। আল্লাহ হচ্ছেন একক, তাঁর ওপর বহুত্ব আরোপ করা অন্যায়। আল্লাহ হচ্ছেন পরিপূর্ণ, তাই অশুভ সাধন তার পক্ষে সমভব নয়, তবে আল্লাহর পরিকল্পিত ব্যাখ্যায় অশুভের স্থান আছে। কেননা জগৎ অনন্ত নয়, সে সীমাবদ্ধ বটে। অশুভের সঙ্গে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু মানুষের জন্য অশুভ প্রয়োজনীয়।

> *ইবনে সিনার দার্শনিক অবস্থান প্রায় বৈপ্লবিক। তাঁর অনেক বক্তব্য বিজ্ঞানীদের মতো। তিনি মনে করেন তার অনেক বক্তব্যই বিজ্ঞানীদের মতো। তিনি মনে করেন মানুষের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ হান বিশ্বাস নয়, যুক্তিবুদ্ধি।*

মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে তার নির্দিষ্ট মত ছিল। তিনি মনে করবেন পুনরুজ্জেবন ঘটবে দেহের নয়, আত্মার। দেহের পুনরুজ্জীবন ঘটলে দেহের কোন রূপটিকে গ্রহণ করা হবে? দুর্ঘটনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যার মৃত্যু ঘটেছে, তার ওই বিকৃত দেহের পুনরুজ্জীবন কি যৌক্তিক হতে পারে? একজনের কোন বয়সের দেহ পুনরায় জীবন লাভ করবে, যৌবনের নাকি বার্ধক্যের? এসব প্রশ্ন তুলে ইবনে সিনা দৈদিক পুনরুজ্জেবনের তত্ত্বকে নাকচ করে দিয়েছেন। ধর্মমতে পুনরুজ্জীবনের তত্ত্বকে তিনি আক্ষরিক অর্থে নেওয়ার পক্ষপাতি নন; তাঁর মতে ধর্মগ্রন্থে আসলে আত্মার কথাই বোঝানো হচ্ছে, সাধারণ মানুষের বুঝবার সুবিধার জন্য রূপক ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এমনকি কোরানে যে বেহেস্ত দোজখের বর্ণনা আছে তাকেও তিনি রূপক অর্থেই নেবার পক্ষপাতি।

ইবনে সিনা আপোষ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই এমনকি চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর অবদানকে যারা উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে তাঁরাও তাঁকে বিপথগামী বলতে ছাড়েননি। তিনি মূলধারার অন্তর্গত হতে পারেননি।

সেকালে মূলধারার শক্তিশালী মুখপাত্র ছিলেন গাজ্জালী। যিনি ইবনে সিনার পরে এসেছেন, এবং ইবনে সিনার দার্শনিকতাকে নাকচ করে দিয়েছেন। গাজ্জালী রক্ষণশীল আসরাইতদের একজন, তিনি মোতাজিলাদের মুক্ত-চিন্তার বিরোধী। ইবনে সিনার যুক্তি-বুদ্ধির জায়গায় তিনি ধর্মবিশ্বাসের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। সে ব্যাপারে

তার যোগ্যতায় খন ঘাটতি ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত ও সন্মানিত। তদুপরী তার রচনা ছিল শক্তিশালী।

দর্শনে তিনি নানা ধরনের অসঙ্গতি দেখতে পান, এবং সেগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। দর্শন থাকতে পারে, কিন্তু থাকবে সে ধর্মশাস্ত্রের অধীনে, ওপরে নয়, স্বাধীনভাবেও নয়।

> *তিনি খুব জোড় দিয়েই বলেছেন যে, নীতি শিক্ষাকে কার্যকর করার জন্য দোজখের ভয়কে ফেরত আনা চাই। ফেরৎ আনার কথাটা উঠেছে এজন্য যে, মোতাজিলাদের দর্হন চর্চার দরুন ওই ভয়টা পেছনে চলে যাচ্ছিল, অন্ততঃ শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে। গাজ্জালী বললেন যে, জীবনযাপনে নৈতিক মূল্যবোধ প্রধান হবে না যদি না মানুষ শাস্তির ভয় পায়। তাই দোজখের যন্ত্রণাকে জনচিত্তে বাস্তবিক করে তোলা আবশ্যক।*

দর্শন নিয়ে সাধারণ মানুষের মাথাব্যথা থাকার বিপক্ষে তিনি। কেননা তাতে তারা বিপথগামী হতে পারে। আর নিম্নস্তর অতিক্রম করে যারা উচ্চস্তরে আরোহন করতে চায়, তাদের উচিৎ দর্শন চর্চার বিপক্ষে যেগুলো যুক্তি রয়েছে, সেগুলো পাঠ করা এবং সর্বোচ্চ স্তরে যখন কেউ পৌঁছুবে, তখন তার জন্য সম্ভব হবে যুক্তি-বুদ্ধি নয়, বোধির সাহায্যে আনন্দলোকে পৌঁছে যাওয়া, যেখানে আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব হবে, উজ্জ্বলতার মধ্য দিয়ে। এই স্তরে আত্মা ছায়া নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না, চূড়ান্ত বাস্তবতার সম্মুখে চলে আসবে। সেখানে শাস্তির ভয় কিংবা পুরস্কারের আশা আর কাজ করবে না।

গাজ্জালীর পরে ইবনে রুশদ এসেছেন, ইসলামিক দর্শনের জগতে তাঁর অবদানও অনেক বড়। তিনি গাজ্জালীর পক্ষে ছিলেন না, বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। গাজ্জালী একটি বই লিখীচিলেন দর্শনকে ধবংস করার অভিপ্রায়ে, ইবনে রুশদ বই লিখলেন ওই ধবংস প্রক্রিয়াকে ধবংস করার ইচ্ছা থেকে। তিনি বিজ্ঞানে আস্থা রাখেন এবং যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যে রাষ্ট্রও সমাজের উন্নতি সম্ভব বলে মানেন। ধর্মের নৈতিক দিকটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ধর্মের বিধিগুলো হচ্ছে আইনের মতো, তাদেরকে মান্য করা জরুরী। তবে প্রকৃত নৈতিকতা অর্জনের পথটা ভিন্ন, সেটি হচ্ছে যুক্তি-বুদ্ধির অনুশীলন।

ইবনে রুশদ জনপ্রিয় হননি। সাধারণ মানুষ তাঁর বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। তবে এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে, তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য মনস্কতা ছিল; তিনি গাজ্জালীপন্থী নন ঠিকি কিন্তু গাজ্জালীর মত তিনিও বলেছেন দর্শন নিয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তা করা উচিৎ নয়। মানুষকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। সর্বোচ্চ স্তরে থাকবে দার্শনিকেরা, দ্বিতীয় স্তরে থাকবে সেই সব যুক্তিবুদ্ধির মানুষেরা অনুশীলনের মাধ্যমে যারা বিশ্বাসে জগৎ থেকে দার্শনিকতার জগতে নিজেদেরকে উত্তীর্ণ করেতে পারবেন। তৃতীয় স্তরে সাধারণ মানুষ। এই

সাধারণ মানুষের উপর ইবনে রুশদের আস্থা চিল না। এদেরকে তিনি মনে করতেন আবেগতাড়িত ও যুক্তিবুদ্ধিহীন। ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা এই সাধারণ মানুষকে জানানো অনাবশ্যকই নয়, ক্ষতিকারকও বটে। তাদের জন্যই ক্ষতিকর, কেননা এর দ্বারা তারা শুধু বিচলিত হবে।

৬

তাহলে আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুবো? সেটা বোধ হয় এই যে, ইহজাগতিকতা কখনওই নিরাপদ ছিল না। তার প্রধান কারণ ভয়। ভয় ছিল শ্রেনীগত, গোষ্ঠীগত, সম্প্রদায়গত এমনকি জাতগতও। স্বার্থহানির ভয়। ব্যক্তিও ভয় পায়। তারও স্বার্থ থাকে। ব্যক্তি ইহজাগতিক হতে কুণ্ঠিত হয় আরো একটি বিশেষ কারণে। এটিও ওই ভয়ই। পরকালের ভয়।

ইহজাগতিকতার শত্রু আসলে অনেক। প্রত্যাশা রয়েছে, প্রত্যক্ষে রয়েছে, রয়েছে পরোক্ষে। যে দাঋশনিকতা স্থিতাবস্থার সমর্থন করে সে এমনকি ইহজাগতিক হলেও ইহজাগতিকতার সঙ্গে প্ররোক্ষ শত্রুতাতেই লিপ্ত হয়। এর প্রথম কারণ, মানুষ যখন দেখে সামনে কোন পথ নেই, তখন সে পেছন দিকে মুখ ফেরায়। কেউ হয় পুনরুজ্জীবনবাদী, কেউ বা হয় মাদকাসক্ত।

> *মাদকাসক্তির নানা রূপ আছে। একটি হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। মানুষ স্বভাবতই অস্থির, সম্মুখযাত্রার উপায় না থাকলে পশ্চাৎগামী হতে বাধ্য। দ্বিতীয় ঘটনা যা ঘটে তা হলো হতাশা। স্থবিরতা হতাশার জন্ম দেয়। মানুষ তখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে অলৌকিকে আস্থা রাখে।*

পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়ই ইহজাগতিক। কিন্তু তারা আবার ইহজাগতিকতার সঙ্গে শত্রুতাও করে। শত্রুতার একটি রূপ হচ্ছে দারিদ্র সৃষ্টি, দারিদ্র সৃষ্টি হয় শোষন ও বৈষম্যের কারণে। আর দারিদ্র মানুষকে ধর্মমুখী করে তোলে, আশ্রয় বিচার আর সান্ত্বনার প্রয়োজনে; ইহজগতে যা তারা পায় না। দ্বিতীয়ত পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা সরাসরি ধর্মের পক্ষে বলতে থাকে, যদিও তাদের নিজেদের জীবনে প্রকৃত ধর্মচর্চার লক্ষণ বলতে গেলে দেখাই যায় না।

সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে ভাববাদিতাকে উৎসাহিত করে তার বাস্তব দৃষ্টান্ত মার্কিন আধিপত্যকে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তৎপর দুইজন পুরুষের বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর

পঞ্চাশের দশকে এদের একজন, জন ফস্টার ডালেস বলেছিলেন যে প্রাচ্য দেশের ধর্মবিশ্বাস কখনোই সাম্যবাদী বস্তুবাদ ও নিরীশ্বরবাদকে মেনে নেবে না, তাই চেষ্টা করতে হবে কমিউনিজম-বিরোধী মতাদর্শের সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় ধর্মবিশ্বাসে একটি ঐক্য স্থাপনের। অপরজন চেস্টার বাওলস পরামশ দিয়েছেন গান্ধীবাদের মতো মতাদর্শকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। কেননা, তাঁর মতে সামরিক বা অর্থনৈতিক সাহায্য নয়, বরঞ্চ গান্ধীবাদের ধারায় কাজ করাটাই হবে প্রাচ্যের জনগণকে সাম্যবাদ বিরোধী করার প্রকৃষ্ট পন্থা। (*উদ্ধৃত, সতীনাথ চক্রবর্তী, ভাবাদর্শগত সংগ্রাম ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের উত্তরাধিকার, কলকাতা,* ১৯৯২)

রাষ্ট্র ও সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ইহজাগতিকতা প্রতিষ্ঠা করা যে কতা কঠিন বাংলাদেশকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিলে সেটা বুঝতে সবিধা হবে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। নতুন রাষ্ট্রের হবার কথা ছিল পরিপূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ ও ইহজাগতিক।

> *সংবিধান যখন রচিত হয় তখন ওই অধিকারই ব্যক্ত করা হয়েছিল। চারটি রাষ্ট্রীয় মূল নীতির মধ্যে ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে খুব স্বাভাবিক ছিল এই অঙ্গীকার। কিন্তু এর জন্য যে সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি প্রয়োজন দেশে তা ছিল না। রাজনৈতিক প্রস্তুতিও ছিল না।*

একাত্তরের যুদ্ধে প্রস্তুতিবিহীন অবস্থাতেই বা-ালীদেরকে যেতে হয়েছে। যুদ্ধের পর যখন সংবিধান তৈরী হলো (১৯৭২ সালে) তখন রাষ্ট্রীয় মূলনীতি চারটির কী তাৎপর্য তা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে স্পষ্ট ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বা-ালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র - এদের প্রতিটির জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল প্রধান শর্ত। কিন্তু সে এসেছে সবার পরে। জিয়াউর রহমানের বিপ্লবের পরে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিশ্চিহ্নই করে দেওয়া হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে, সমান বেগে প্রথম মূলনীতি হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে ‘সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস’কে।

পরিবর্তনটা পরের ঘটনা। তার আগেও কি ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে পরিস্কার কোন ধারণা ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের? সংবিধান বলছে ছিল না। সংবিধানে উল্লেখ আছে (অনুচ্ছেদ ১২) যে ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়নের জন্য ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার ঘ) কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে। কিন্তু বলা হয়নি যে, ধর্মনিরপেক্ষতা জিনিসটি কি। বলা দরকার ছিল যে,

ধর্ম থাকবে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে, সেখানে রাষ্ট্রের কোন হস্তক্ষেপ যেমন ঘটবে না, তেমনি রাষ্ট্রের কোন নিজস্ব ধর্ম থাকবে না, রাষ্ট্র হবে ধর্মহীন। রাষ্ট্রের ধর্মহীনতার এই ব্যাপারটি রাজনৈতিক নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষতার উপরে-উদ্ধৃত সাংবিধানিক সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ধর্মের অপব্যবহার' বিলোপ করা হবে; বললে ভাল হতো যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার মাত্রেই অপব্যবহার; তাই অপব্যবহার নয়, ধর্মের সবরকম রাজনৈতিক ব্যবহারই বিলুপ্ত করা হবে।

পাকিস্তানী কারাগার থেকে ঢাকায় ফিরে এসে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করাছিলেন তাৎপর্যহীন নয়। ওই বচ্চরই ৭ঈ জুন তারিখের বক্তৃতায় মুজিব রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বাংলাদেশ হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে, হিন্দু হিন্দুর ধর্ম পালন করবে। খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নেই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে।' কথার সুরে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভাব রয়েছে এবং প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারটি মোটেই আসছে না।

মুজিবের পরে জিয়াউর রহমান যখন রাষ্ট্রক্ষমতা পেলেন, তখন তিনি এ ব্যাপারে কোন দোদূল্যমনতাই প্রকাশ করেননি, ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরাসরি নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। এরশাদ এসে ঘটনাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তিনি রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন করেছেন। আর আজ এমন অবস্থা হয়েছে যে, আমেরিকানরা আমাদের রাষ্ট্রকে নরমপন্থী মুসলিম রাষ্ট্র বলায় রাজনৈতিক বড় নেতৃত্ব কোনো প্রতিবাদ করছে না, বরঞ্চ খুশি হচ্ছে এই কথা ভেবে যে, তাও যা হোক চরমপন্থী বলেনি।

ধর্মকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি) এনেছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগও এনেছে, দেশের জনগণ কিন্তু বরাবরই ধর্মনিরপেক্ষ। তারা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল সেটা পারলৌকিক কারণে নয়, ইহজাগতিক মুক্তি পাবে এই আশাতেই। একাত্তরে তারা যুদ্ধ করেছে ইহজাগতিকতার পক্ষেই। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার শাসক শ্রেনী করেছে এবং সেই রাজনীতি তাঁরা জনগণের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে।

জনগণকে ইহজাগতিকতায় উদ্বুদ্ধ করার কাজ অতীতের শাসকেরা করেননি, এখনকার শাসকেরাও করছেন না। কারণটা আর কিছু নয়, ভয়। সাধারণ মানুষ দার্শনিকতায় শিক্ষিত হোক, এটা গ্রীক দার্শনিকেরা চাননি,

ধর্মব্যবসায়ীরা চায়নি, ইবনে সিনার মত বিপ্লবী চিন্তাবিদ পর্যন্ত চাননি। কিন্তু এই চর্চা তাঁদেরকে চাইতে হবে যাঁরা সত্যি সত্যি ইহজাগতিকতা চান।

কেননা জনগণকে সঙ্গে না পেলে রাষ্ট্র বদলাবে না, সমাজ তো অবশ্যই বদলাবে না। আর রাষ্ট্র ও সমাজ না বদলালে, অর্থাৎ তারা শত্রুতা করলে, ইহজাগতিকতা এগোতে পারবে না, যেমন আজকের বিশ্ব অত্যন্ত বস্তুবাদী হওয়া সত্ত্বেও ইহজাগতিক হচ্ছে না, ধর্ম নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, ধর্মীয় মৌলবাদ নানাক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

বি এন পি বলে তাদের প্রতিষ্ঠাতা মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, কিন্তু তারা সরকার গঠন করেছে ধর্মীয় মৌলবাদী একাধিক দলকে সঙ্গে নিয়ে; ওদিকে আওয়ামী লীগ শোনা যাচ্ছে আরো ভোটের আশায় নিজেদের গঠনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে ক্ষীণমান ও প্রায় অর্থহীন অসাম্প্রদায়িকতাকে বসাবে।

বস্তুত ইহজাগতিকতার পক্ষে দাড়াতে হবে তাঁদেরকেই যাঁরা যথার্থ গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতিতে বিশ্বাস করে। আরজ আলী মাতুব্বর যেমন দাঁড়িয়েছিলেন, একাকী। আরজ আলী মাতুব্বর কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, আমাদের জন্য তিনি অনুপ্রেরণা, এবং অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

Monday, March 01, 2004
Rationalist Day, Mukto-mona